ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

আকাশ মালিক

(৩)

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

হজরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক এতদ্‌যাবত মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ উসমানের (রাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের শারীয়া আইন অনুসরণের উদাহরণ দেখে নি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরআন সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলো না। হজরত উসমান (রাঃ তাঁর দুধ ভাই, মিশরের অধিপতি, আল্লাহ্‌র বাণী কোরআনে অবিশ্বাসী, আবদুল্লাহ্‌ বিন সা'দ বিন আবি সারাহকে (রাঃ) কোরআন সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

নবী মোহাম্মদ (দঃ) লিখতেও পারতেন, পড়তেও পারতেন। কিন্তু নিজে কোরআন লিখেন নাই। তাঁর মুখনিঃসৃত কথা, স্বর্গীয়-বাণী বলে দাবীকৃত বিধায় উপস্থিত শ্রোতা যে যেভাবে পারেন, স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। কেহ কেহ তাঁর কথা, পাথরে, খেজুর পাতায়, কাগজে, পশুর চামড়ায় ও কাঠের টুকরায় লিখে রাখতেন। তাওরাত, জবুর ও ইনজীল কিতাব অনুসারীদের কাছ থেকে মোহাম্মদের (দঃ) শুনা ঘঠনাবলী ও মোহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে মানুষের ঐ শুনা কথা, বিভিন্ন বস্তুতে, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাক্য সমুহই কোরআন। কোরআন সম্পাদনায় মোহাম্মদকে (দঃ) যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের কাব্যিক ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস, ততকালীন এবং ইসলাম পূর্ববর্ত্তি আরবীয় একাধিক কবি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধারকৃত। একদিন নবীজীর কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) কোরআনের সুরা ক্বমর (চাঁদ) আবৃত্তিকালে ইমরুল কায়েসের মেয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। কায়েসের মেয়ে রাগান্বিত হয়ে ফাতিমাকে (রাঃ) বল্লেন- 'সর্বনাশ, এটাতো আমার বাবার লিখা একটি কবিতার পংক্তি। তোমার বাবা, আমার বাবার কবিতা নকল করে আল্লাহ্‌র বাণী বলে কোরআনে ঢুকায়েছেন।' খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ইমরুল কায়েসের ধর্মীয় ভক্তিমুলক কবিতাগুচ্ছ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্বে লিখা। মোহাম্মদ (দঃ) কখন কি ভাবে ঐ কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন তা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

গ্রন্থাকারে কোরআন তৈরী করার ধারণাটা প্রথম আসে হজরত ওমরের (রাঃ) মাথায়। হজরত ওমর (রাঃ) খলিফা আবুবকরকে (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রস্তাব দিলে আবুবকর প্রথমে রাজী হন নি। আবুবকর (রাঃ) জানতেন বিষয়টা স্পর্শকাতর ও কষ্ঠসাধ্য ব্যাপার। উসমান (রাঃ) যখন পুনরায় এ উদ্যোগটা নিলেন, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সিরিয়া, কুফা, বসোরা, আজারবাইজান, মিশর সহ বিভিন্ন এলাকার কোরআন, আর মদীনায় ওমরের (রাঃ) নির্দেশে তৈরী, তাঁর মেয়ে হাফসার কাছে গচ্ছিত কোরআনের মধ্যে বিস্তর তফাত। স্বেচ্ছাচরী, স্বৈরাচারী, জগতজুড়ে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপথ্য বিস্তারের উচ্চাবিলাসী কোরায়েশ

শাসকগণ তাঁদের প্রজা নির্যাতন, অপশাসন ও শোষনের বৈধতা যখন কোরআনিক নির্দেশ বলে দাবী করতেন, তখন নির্যাতিত শোসিতেরা কোরআন দিয়েই প্রমান করার চেষ্টা করতেন, শাসকেরা তাঁদের স্বার্থানুযায়ী কোরআনে পরিবর্তন পরিবর্ধন এনেছে এবং তাঁরা কোরআনের ভুল ব্যখ্যা করে। সাহাবী হজরত আবু জওহর গিফ্‌ফারী (রাঃ) সিরিয়ার স্বৈর-শাসক হজরত মোয়াবিয়াকে (রাঃ) সরাসরি কোরআন বিরোধী শাসক বলে অভিযোগ করেন। আবু জওহর কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বল্লেন- 'আপনি যে জনগনের সম্পদ দিয়ে রাজ-প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন এবং রাজকীয় বেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন তা কোরআনের পরিপন্থি।' মোয়াবিয়া (রাঃ) আবু জওহর গিফ্‌ফারীকে (রাঃ) ধমক দিয়ে বল্লেন- 'বে-কুবের দল, রাষ্ট্রীয় আয় ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের মালিক জনগন নয়। সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌ই আমাকে তাঁর সম্পদের রক্ষক হিসেবে মনোনীত খলিফা করেছেন। সম্পদ ব্যবহার হবে জনগনের নয়, বরং খলিফার ইচ্ছানুযায়ী ।'

জনগনের কাছে যখন সারা মুলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্ণর সহ স্বয়ং খলিফা উসমান কোরআন বিরোধী, অনৈসলামিক শাসক বলে বিবেচিত, তখন উসমানের (রাঃ) কোরআন-সংকলন মানুষের কাছে কতটুকু সমাদৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হজরত উসমান (রাঃ) যায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) কে সর্বপ্রধান করে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়ের, সা'দ ইবনুল আ'স এবং আব্দুর রহমান বিন হারেস সহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোরআন-সংকলন কমিটি গঠন করলেন। নির্দেশ দিলেন, মদীনার ওহী লেখকদের সাথে যদি ভাষাগত মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে কমিটি যেন কোরায়েশদের ভাষা অনুসরণ করে। খলিফা আরো বল্লেন- 'এই কমিটি কর্তৃক প্রণীত কোরআনই হবে সরকার অনুমুদিত পরিপূর্ণ বৈধ কোরআন এবং রাজ্যের অন্যান্য সকল কোরআন অবৈধ বলে গন্য হবে।' কোরআন লিখা হলো। উসমান (রাঃ) কমিটিকে কোরআনের ৭টি কপি তৈরী করতে আদেশ দিলেন। ৭টি রাজ্যে কোরআনের ৭টি কপি পাঠিয়ে তথাকার বাকী সব কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। বেসরকারী সকল কোরআন পুড়িয়ে ফেলা হলো। এবারে আরব-অনারব, হাশিমী-উমাইয়া, কোরায়েশ-অ-কোরায়েশ নয়, রাজ্যের সকল প্রদেশের সকল এলাকা থেকে, সকল সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ, খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো। খলিফা উসমান (রাঃ) ১২টি বৎসর খেলাফত কালের পূর্ণ ১০টি বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কাটিয়েছেন। অন্যায়ভাবে বিরাট ভূ-খন্ড দখল করা হলো, যশ, মান, পদোন্নতি, জগতের অফুরন্ত ধন-ভান্ডার, সম্পদ, দাস-দাসী সবই পদানত করা হলো। তবু, হায় ! হায়রে শান্তির ধর্ম ! হায়রে সাম্যের ইসলাম ! অগণিত নিরপরাধ নারী-পুরুষ শিশু-কিশোরের প্রান সংহার করে, এতসব মানব-রক্ত পান করেও তার রক্ত-পিপাসা নিবারণ হলো না। ইসলাম এবার নিজের রক্তপান করতে উদ্যোত হলো। রাজ্যের সকল এলাকা থেকে সরকার বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠলো। তাদের এক দফা, এক দাবী। স্বৈর-শাসনের পতন হউক। সর্বদলীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে যারা এগিয়ে আসলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেয়া হলো।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ)-

মুহাম্মদ ছিলেন, সাহাবী হজরত আবুবকরের (রাঃ) কনিষ্ঠ পুত্র। আবুবকরের (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী, শিশু পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে হজরত আলীকে (রাঃ) বিয়ে করেন। আবুবকরের (রাঃ) স্নেহের সন্তান, নবীজীর প্রীয় স্ত্রী বিবি আয়েশার

(রাঃ) আদরের ভাই মুহাম্মদ ছিলেন যথেষ্ঠ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী। হজরত আলীর পোষ্যপুত্র মুহাম্মদ, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে, হজরত ওমরের (রাঃ) নির্বাচন কমিটির ওপর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও স্বজন-প্রীতির অভিযোগ করেছিলেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভের পরপরই তাঁর অদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা, অন্যায় শাসন সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ মদীনা ছেড়ে মিশর চলে যান।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ)-

রাসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) বিশেষ সম্মানিত সাহাবী হজরত আবু হুজাইফার (রাঃ) পুত্র মুহাম্মদ। তাঁর পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে (আবুবকরের আমলে) মৃত্যুবরণ করার পর থেকে খলিফা উসমানেরই (রাঃ) গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। বড় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) বুঝতে পারলেন, ইসলাম প্রচারের নামে জগত জুড়ে যে অত্যাচার-অনাচার চলছে তা কোন ভাবেই ধর্ম-সমর্থিত হতে পারেনা। স্বদেশ ত্যাগ করে মুহাম্মদ মিশরে চলে আসেন। মিশরের আদিম অধিবাসী কীবতি সম্প্রদায় কোরায়েশদের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারতো না। মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) মিশরের নির্যাতিত নিপিড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মিশরের গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন সা’দ বিন আবি সারাহ’র দিকে ইঙ্গিত করে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শাসকদের বিলাসিতাপ্রীয়, কোরআন-হাদীস বিমূখ আসল চেহারা। মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা এই দুই মুহাম্মদ, সুদীর্ঘ ১২টি বৎসর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলতে থাকেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা’বা-

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা’বা বিলাসবহুল জীবন ঘৃণা করতেন। ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিলনা। তিনি হজরত আলী (রাঃ) কে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, হজরত আলীর (রাঃ) ভেতর নবী মুহাম্মদের (দঃ) সকল প্রকার গুনাবলী বিদ্ধমান বিধায় নবীর মৃত্যুর পর হজরত আলীই প্রথম খলিফা হওয়ার কথা। পরপর তিনজন খলিফা জবরদস্তি ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। বসোরায় আব্দুল্লাহ ইবনে সা’বা তাঁর এই বিশ্বাসের পক্ষে প্রচারণা করতে থাকেন। বসোরার গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন আমীর, আব্দুল্লাহ ইবনে সা’বাকে তার দেশ থেকে বহিস্কার করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সা’বা কুফায় চলে যান। সেখানে হজরত আলীর বহু সমর্থক ছিল। বসোরা ও কুফায় তাঁর বিশ্বাসের প্রতি প্রচুর লোক সমর্থন জানায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সা’বা সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ায় তখন উসমানের উমাইয়া বংশীয় সরকার হজরত মোয়াবিয়ার যাঁতাকলে, হাশিমী বংশের শাসরুদ্ধকর অবস্থা। পরিশেষে সিরিয়া ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফার সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি ‘সাবায়ী’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্টিত করেন।

সারা মুসলিম বিশ্বে যে, স্বৈরাচারী-শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করছে, হজরত আলী তা আঁচ করতে পেরে খলিফা উসমানকে কতকগুলি সুক্ষ্ম পরামর্শ দিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মানুষ যে কত অন্ধ হতে পারে, ৮০ বৎসর বয়স্ক হজরত উসমান তার প্রকৃষ্ট প্রমান। তিনি আলীর পরামর্শ গ্রাহ্য তো করলেনই না বরং বিদ্রোহের প্ররোচনাকারী বলে হজরত আলীকে অপবাদ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে। সমগ্র

দেশটা গণ-আন্দোলনের বিস্ফুরণ অবস্থায় দেখেও হঠাৎ করেই উসমান নতুন একটি প্রথার উদ্ভব ঘঠালেন।

প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথা-

দুটি উদ্যেশ্যে হজরত উসমান এ কাজটি করেছিলেন। (১) স্বগোত্রীয় বিত্তশালী লোকদের সমর্থন অর্জন। (২) গরীব প্রজাদেরকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর, আর কৃষকদেরকে ভূমিহীন করণ।
তাঁর ধ্বংসমুখী আইনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে- 'দেশে মাত্রাতিরিক্তভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশী হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে নাগরীক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে নবাগত মুসলিম অধিবাসীদের বেশীর ভাগই যাযাবর-বেদুঈন কিংবা গ্রাম্য অনারব। এরা মূর্খ ও বর্বর। এদের রুচী আচরণ কদর্য, অভদ্র ভাষা, অসভ্য ব্যবহার ও রীতি-নীতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এদের দ্বারা দেশের শান্তি বিপন্ন হচ্ছে।'

আসলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে। ধর্ম প্রচারের নামে খুন, লুট, ডাকাতীকে আরবগণ পেশা হিসেবে গ্রহন করে নেয়। ডাকাতি শুধু লাভজনক একটি বৈধ ব্যবসাই নয়, পুণ্য কাজ বলেও শাসকগণ প্রচারণা করতেন। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে ইসলাম ধর্ম কবুল করে দস্যুতা গ্রহন ছাড়া কোন গতি ছিলনা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে মুসলমান হলো, সৈনিক দলে যোগদান করে লুটকৃত সম্পদের অংশীদার হলো, সাথে নিয়ে আসলো কুসংস্কার, বিশৃংখলা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃখলতা, অজ্ঞতা ও অরাজকতা। তাছাড়া ক্ষমতাশীল, বিত্তবান সাহাবীগণের যৌনক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে গণিমতের মাল হিসেবে রক্ষিতা, যুদ্ধ-বন্দী নারীগণ, তাঁদের গর্ভজাত জারজ সন্তানাদি সমাজ ও শাসকদের জন্য উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়।

উসমানের *'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথা'* নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত একটা জাতীকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় নাই, সে কথা বুঝতে কারো বাকী রইলো না। বেশ কয়েকজন সাহাবী এর প্রতিবাদ করলেন। প্রাক্তন বিশিষ্ঠ সাহাবীগণ অভিমত প্রকাশ করলেন, শরিয়ত বিরোধী এ সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে মুসলিম জাতী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে। এবারে নবীজীর আমলের খ্যাতনামা সাহাবী, দেশের বরণ্যে উলামাগণ বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। এমনকি এক কালে উসমানের ডান হাত হজরত তালহা (রাঃ), হজরত যোবায়ের (রাঃ), কুফার কোষাধক্য সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী ও সরকারী কর্মচারী খলিফার বিরুদ্ধে চলে যান। উসমান কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করলেন। কয়েকজন সাহাবীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন, কিছু লোককে প্রাসাদে ডেকে এনে স্বহস্তে অমানুষিক নির্মম শাস্তি প্রদান করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি হজরত উসমানের ভাষা ছিল অত্যন্ত অশ্লীল, অকথ্য, অমার্জিত। হজরত আলীও উসমানের অকথ্য ভাষায় গালাগালি থেকে রেহাই পান নি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাহাবী হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) যিনি হজরত ওমর কর্তৃক খলিফা নির্বাচন কমিটির প্রধান হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে উসমানকে

খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন, সাহাবী হজরত যায়ীদ বিন সাবিত (রাঃ) যাঁকে উসমান তাঁর কোরআন সংকলন কমিটির প্রধান বানিয়েছিলেন, সাহাবী হজরত আমর ইবনুল আ'স, যাঁর কথায় উসমান (রাঃ) ওমরের খুনী পুত্র উবায়দুল্লাহ্‌কে বিনা শাস্তিতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এঁরা সহ হজরত আলী (রাঃ) বিদ্রোহী দলের প্রথম সারিতে এসে অবস্থান নেন। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে রাজধানী সর্বত্র বিক্ষোভের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া খলিফাকে বার্তা পাঠালেন- 'আমিরুল মোমেনিন, আপনি অতি সত্ত্বর সিরিয়া চলে আসুন, মদীনায় আপনার প্রাণের নিরাপত্তা আর নেই, নতুবা সামরীক আইন জারী করুন আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবো।' খলিফা কোনটাই করলেন না। গণ-অভ্যুত্থানের হাওয়ায় মদীনা উত্তপ্ত। উসমান টের পেলেন বিপদ আসন্ন। তিনি হজরত আলীর স্মরণাপন্ন হলেন।

হজরত আলীকে ডেকে এনে উসমান (রাঃ) নিজের ভুল স্বীকার করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আসলে তিনি ভুল স্বীকার করেন নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে হজরত আলীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। উসমান বল্লেন- 'আলী, এখন থেকে আমি শুধু তোমার কথাই শুন্‌বো। মোয়াবিয়া, মারওয়ানের পরামর্শ নেয়া আমার ঠিক হয়নি। আজ থেকে তুমি যেভাবে বলবে রাষ্ট্র সেভাবে চলবে।'

আলীর মনে পড়লো ক্ষমতা ও সম্পদ লোভী, আত্মম্ভরী, সেচ্ছাচারী উসমানের সুদীর্ঘ ১২ বৎসর শাসনের কলংকিত দিন গুলোর কথা-

উসমান তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনী সাহাবী হজরত ওমরের পুত্র হজরত ওবায়দুল্লাহ্‌কে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোরআন সংকলন করে রাজ্যের সর্বত্র মানুষের হাতে লেখা কোরআন আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। সে গুলোতে কি লিখা ছিল পৃথিবীর মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না। গরীব কৃষকদের জমি জবরদস্তি দখল করে মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণ করে মানুষকে ভিটেহীন করেছেন। ঘোড়ার ওপর ট্যাক্স্‌ আরোপ করে নবীর আদর্শকে কলংকিত করেছেন। 'প্রজাসত্ত্ব হস্তান্তর' আইন প্রনয়ন করে নিজের আত্মীয় উমাইয়া বংশের মানুষকে জমিদার বানিয়ে সাধারণ মানুষকে ভিখারী করেছেন। মাদকাসক্ত, ভ্যাবিচারী মিথাচারী, দেশের স্বঘোষীত নামকরা সন্ত্রাসী, যাদের মধ্যে চরিত্রের বালাই নেই তাদেরকে গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেছেন। বায়তুল-মাল থেকে টাকা আত্মসাৎকারী কুফার গভর্ণর কুখ্যাত অলিদের কথায় তার কোষাধক্য সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে সকলের সম্মুখে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছেন। এইতো সেদিন ইবনে মাসউদকে (রাঃ) মসজিদে দেখে উসমান বলেছিলেন- ঐ দেখো বাঁদীর বাচ্চা নষ্টের কীট এসেছে, সে যে পাতে খায় সেই পাতে মল ত্যাগ করে। ইতিপূর্বে ইবনে মাসউদ (রাঃ) অলীদের অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। হজরত আয়েশা মসজিদ সংলঘ্ন ঘর থেকে উসমানের গালিগালাজ শুনে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন- আপনি নবীর বিশ্বস্ত সাহাবীদেরকে এমন ভাবে গালাগালি করছেন? আয়েশার কথায় খলিফা ভীষন রাগান্বিত হয়ে ইবনে মাসউদকে (রাঃ) এমন লাথি মেরেছিলেন যে, সাহাবী মাসউদের কোমরের একটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় মাসউদকে (রাঃ) সেদিন উসমান টেনে হেঁচড়ে মসজিদে নববী

থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে সাহাবী হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) খলিফার অর্থনৈতিক সেচ্ছাচারীতার প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ খলিফার ওপর বায়তুল-মাল থেকে যুদ্ধ-লব্ধ গণিমতের মাল, কিছু স্বর্ণালংকার ও মণি-মুক্তা চুরির অভিযোগ এনেছিলেন মদীনার কিছু লোক। খলিফার বেশ কয়েকজন আত্মীয়ের গায়ে সেই অলংকারের প্রমানও তারা দেখিয়েছিলেন। উসমান মোয়াবিয়ার ভাষায় বলেছিলেন- বায়তুল-মালের সম্পদের মালিক আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্র মনোনিত খলিফা। আল্লাহ্র মনোনয়ন ছাড়া খলিফা হওয়া যায় না। সম্পদ ব্যবহার হবে আমার ইচ্ছায়, তোমাদের তাতে কিছু বলার কোন অধিকার নেই। আম্মার ইবনে ইয়াসের ও হজরত আলী একসাথে সমস্বরে বলেছিলেন- খলিফা, আল্লাহ্র কসম, আমি হবো আপনার প্রথম প্রতিবাদী। বায়তুল-মালের সম্পদের জবাবদিহী আপনাকে করতেই হবে। উসমান, আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে বন্দী করে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তিন দিন তাঁকে বেহুশ হয়ে মৃত অবস্থায় উম্মে সালমার (রাঃ গৃহে পড়ে থাকতে হয়। আয়েশাও সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

উসমান সেদিন আলীকেও বলেছিলেন-বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমারও আম্মারের অবস্থা হবে। আলীও রক্তবর্ণ চোখ দেখিয়ে বলেছিলেন- 'আত্মম্ভরী উসমান, আল্লাহ্র কসম, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম, আমার মা তোমার মায়ের চেয়ে উত্তম, নবীর কাছে আমার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশী। আমাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়' ।

এসব কিছু স্মরণ করে আলী বল্লেন- 'আজ আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। এর আগে বহুবার আপনাকে সতর্ক করেছি, পরামর্শ দিয়েছি, আপনি তা কানেই তোলেন নি। বরং কিছু দিন আগে একজন বিশিষ্ঠ সাহাবী হজরত আবু জওহর গিফ্ফারীকে (রাঃ) বিনা অপরাধে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি এর প্রতিবাদ করায় আপনি আপনার মন্ত্রী মারওয়ানের পক্ষ নিয়ে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন।' উসমানেরও মনে আছে সেদিন হজরত আলী কম বলেন নি। উসমান জানেন কোথায় আলীর পিতা আবুতালিবের হাশিমী বংশ আর কোথায় উসমানের উমাইয়া বংশ। কিন্তু আজ তিনি নীরবে শুধু আলীর কথা শুনতে থাকলেন। উসমান বল্লেন- 'আলী, আমি জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে তাদের দাবী মেনে নেবো, তুমি তাদেরকে মদীনা থেকে ফেরায়ে দাও'। হজরত আলী, তার কাছে ইতি পূর্বে বিদ্রোহীদের দেয়া অভিযোগ ও দাবী সমুহ উসমানকে এক এক করে শুনালেন। অভিযোগ গুলো শুনে হজরত উসমান, সকল দোষ তাঁর পূর্ববর্তি দুই খলিফার ওপর, বিশেষ করে হজরত ওমরের ওপর চাপিয়ে দিলেন। তিনি আঙ্গুলে গুনে কয়েকজন দুর্ধষ দুস্কৃতিকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করে বল্লেন- 'দেখো আলী, এদেরকে খলিফা ওমর গভর্ণর পদে নিয়োগ করে গেছেন। সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া কেমন মানুষ তুমি তো জানো। তার মতো মানুষকে সরায়ে আমার খেলাফত কি একদিনও ঠিকবে'? অতি নম্র ভাষায় উসমান আরো বল্লেন- 'দেখো, বিগত দুই খলিফাও অনেক ভুল করেছিলেন কিন্তু কেউ তো কোনদিন তাদের পদত্যাগ দাবী করেনি, আমার বেলায় কেন এমন

হচ্ছে? আমি শুধু একটি দাবী বাদে জনগণের বাকী সব দাবী মেনে নেবো। আমি ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারবো না'। আলী বল্লেন- 'ঠিক আছে, আপনি যে জনগণের দাবী মানতে রাজী তার একটি প্রমান দিন'।

কিছুদিন পূর্বে নবী-পত্নী আয়েশাও উসমানকে বলেছিলেন- 'খেলাফত ত্যাগ করে জনগণের নির্বচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং আমার ভাই মুহাম্মদকে মিশরের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করুন'। আয়েশা তার ভাই মুহাম্মদকে সরকারী কোন পদ না দেয়ায় উসমানকে সেই প্রথম থেকেই ঘৃণার চোখে দেখতেন। আয়েশা এবং তাঁর ছোট বোনের স্বামী হজরত তালহা (রাঃ) ও বড় বোনের স্বামী হজরত যোবায়ের (রাঃ) যে বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী উসমান তা টের পেয়েছিলেন।

সব কিছু বিবেচনা করে উসমান ঘোষনা দিলেন- 'আজ থেকে মিশরের নতুন গভর্ণর মোহাম্মদ ইবনে আবুবকরকে (আয়েশার ভাই) নিযুক্ত করা হলো। সরকার জনগনের সকল অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সকল দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়েছেন'। ঘোষনা পত্রে উসমান দস্তখত করলেন। মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর কিছু গণ্য-মান্য নেতৃস্থানীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে মিশরের পথে রওয়ানা হয়ে যান। মদীনায় জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা খলিফার ঘোষনা বাস্তবায়নের আশা বুকে ধারণ করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে থাকলেন। মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর, মিশর পৌছার আগেই খলিফা উসমানের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে ধরা পড়ে যায়। উসমান তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরকে একটি চিটি দিয়ে মিশর প্রেরণ করেছিলেন। চিটিতে লিখা ছিল- 'মোহাম্মদকে তার দল নিয়ে মিশর পৌছামাত্র যেন হত্যা করা হয় এবং পরবর্তি নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহীদেরকে বন্দী করে রাখা হয়'। গুপ্তচর মোহাম্মদের দলের হাতে ধরা পড়ে যায়। সকল মদীনায় ফিরে আসলেন। বিচার ডাকা হলো। বিচারের ভার দেয়া হলো হজরত আলীর হাতে। হজরত আলী খলিফা উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন -

- এই গুপ্তচর কি আপনার?
- জ্বী আমার।
- এই উট কি আপনার?
- জ্বী আমার।
- এই চিটির সীল-মোহর কি আপনার?
- হ্যাঁ আমার।
- এই চিটির নীচে স্বাক্ষর কি আপনার?
- হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়।
- এই চিটি আপনি লিখেছেন?
- আল্লাহ্‌র কসম, আমি লিখি নাই।
- আপনি কাউকে লিখতে বলেছিলেন?
- আল্লাহ্‌র কসম, আমি কাউকে লিখতে বলি নাই।

হজরত আলী, লেখা পরীক্ষা বিশেষজ্ঞগণকে চিটির লেখা পরীক্ষা করতে অনুরুধ করলেন। বিশেষজ্ঞগণ একমত হলেন, চিটির লেখা মারওয়ানের হাতের। আলী মারওয়ানকে বিচারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উসমান বাধা দিলেন-

মারওয়ানকে এখানে আনা যাবে না। গর্জে উঠলো উপস্থিত জনতা। মদীনার আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে বজ্রধ্বনি উঠলো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ইন্‌তেকাম ইন্‌তেকাম (প্রতিশোধ প্রতিশোধ)। মুহুর্তে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো মদীনার অলিতে গলিতে। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে দেখে হজরত আলী, হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের সহ অনেকেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। জনতা খলিফার গৃহ অবরোধ করলো। চার হাজারেরও বেশী মানুষের গৃহ অবরোধের শেষ পরিণতি আন্দাজ করতে পেরে আয়েশা চলে গেলেন মক্‌কায় আর আলী শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। স্বপরিবারে পূর্ণ বিশ দিন অবরোদ্ধ অবস্থায় থাকার পরও উসমান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। তাঁর একটি আশা ছিল সিরিয়া ও বসোরা থেকে সৈন্য বাহিনী এসে তাঁকে উদ্ধার করবে। হিজরী ৩৫ সালের ১৭ই জিল্‌হাজ্জ, শুক্রুবার। হজরত মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ) প্রাসাদের ছাদের ওপর দিয়ে জানালা ভেঙ্গে খলিফা উসমানের কক্ষে ঢুকে পড়েন। হাতে উম্মুক্ত শাণিত তরবারী, সঙ্গে আরো ৪ জন। উসমান আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ মিনতি, বেঁচে থাকার শেষ প্রতারণা করলেন। বুকের ওপর দুই হাতে কোরআন ধরে বসে রইলেন। নবীজীর দোহাই দিলেন, মোহাম্মদকে তাঁর পিতা আবু বকরের দোহাই দিলেন, কোরআনের দোহাই দিলেন। মোহাম্মদ ভীষন শক্ত হাতে উসমানের সাদা দবদবে দাঁড়িতে ঝাপটে ধরে টান দেন। উসমান মাটিতে পড়ে যান। উপর্যুপুরি খঞ্জরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় উসমানের সর্বাঙ্গ। ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে গেল সাহাবী হজরত উসমানের দেহ নিঃসৃত রক্তের শ্রোতধারা। তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কোরআনের পাতাগুলো। উসমানের রক্তে সিক্ত, লাল রঙ্গে রঞ্জিত, কোরআনের ছিন্ন পাতাগুলোর সাথে তাঁর প্রাণহীন দেহটিও মেঝেতে পড়ে রইলো তিন দিন তিন রাত্রি। চতুর্থ দিন রাতের অন্ধকারে, গোপনে হজরত আলী কতিপয় যুবককে নিয়ে লাশটি সংগ্রহ করে, জনবিরল এক গলিপথে শহরের বহির্ভাগে নিয়ে জান্নাতুল-বা'কির পার্শ্ববর্তি ফাঁকা জমিতে সমাহিত করেন।

ইসলামের চার খলিফার কেউই তাদেঁর জীবদ্দশায় জনগণের শত দাবীর মুখেও ক্ষমতা ত্যাগ করেন নি। তাদের তিনজনকেই জনতার রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, হজরত উসমানের খেলাফতের মধ্য দিয়ে ইসলামের ঘরে, যে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে, তা হজরত আয়েশার যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। তাই এখানে লেখাটির সমাপ্তি টানতে চাইলেও শেষ করা গেলো না। হজরত আয়েশার আশা ছিল, উসমান পরবর্তি মদীনার খলিফা হবেন তাঁর দুই দুলা ভাই হজরত তালহা (রাঃ) অথবা হজরত যোবায়ের (রাঃ)। জনগণ হজরত আলীকে বিপুল ভোটে মদীনার চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত করে। আয়েশার দেহের শিরা-উপশিরায় উমাইয়া বংশীয় রক্ত প্রবাহিত। হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে আয়েশার শরীরের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। এমনিতেই ইমাম আলীকে মনে-প্রাণে তিনি ঘৃণা করতেন। হজরত আলী ছিলেন বিবি আয়েশার চক্ষুশুল। আয়েশা ছিলেন ভয়ানক হিংসাপরায়ন, ব্যক্তি-স্বার্থপর নারী। যে মহিলার বিছানার ভেতর জিব্রাইল অহী নিয়ে আসতেন বলে নবী মোহাম্মদ (দঃ) গর্ব করতেন, সেই আয়েশা যখন ঘোষনা দিলেন উসমান-হত্যায় আলী জড়িত ছিলেন, মানুষ তা অবিশ্বাস করতে পারলো না। সাহাবী হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের, আলীকে খলিফা মেনে নিয়ে শপথ গ্রহন করেছিলেন। আয়েশার পরামর্শে তারা সে শপথ অস্বীকার করে বল্লেন- আমাদেরকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হয়েছিল

আলীকে খলিফা মানতে। উসমান-হত্যার প্রতিশোধ নিতে হজরত আয়েশার ডাকে উমাইয়া বংশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাঁর সাথে যোগদান করলো বেশ কিছু মুসলিম, যারা নবী মোহাম্মদের (দঃ) অস্ত্রের মুখে প্রাণ রক্ষার্থে মুসলমান হয়েছিল আর যাদের মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন নবী মোহাম্মদের নির্দেশে হজরত আলীর হাতে খুন হয়েছিল।

এদিকে খেলাফত লাভের সাথে সাথে হজরত আলী সকল প্রাদেশিক গভর্ণর পদ বাতিল করে দেন। কিছু উমাইয়া বংশীয় গভর্ণরগণ পদত্যাগ করলো বটে কিন্তু রাজস্ব ভান্ডার লুট-পাট করে শুন্য করে দিল। আর অনেকেই আলীর খেলাফত অস্বীকার করলো। হজরত আলীর জন্য প্রাদেশিক গভর্ণর সমস্যার চেয়ে আয়েশার সৃষ্ট সমস্যা মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেন নি, তাঁর সর্ব কনিষ্ট সৎ-শাশুড়ী বিবি আয়েশা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। হজরত উসমানকে যখন হত্যা করা হয়, আয়েশা তখন মক্কায় ছিলেন। সেখান থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। হজরত আয়েশা, আলী কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত, ইয়েমনের গভর্ণরের দেয়া পুরুস্কার, অত্যাধিক সুন্দর, হৃষ্ট-পুষ্ট তাজা উট আল্-আসকারের ওপর আরোহন করলেন। পেছনে তাঁর ১০০০ হাজার সসস্ত্র সৈন্য। ডান পাশে হজরত তালহা (রাঃ) বাম পাশে হজরত যোবায়ের। আয়েশার জীবনে বাল্যকালের আনন্দ ছিলনা। যৌবন ছিল চরম হতাশা আর বেদনায় ভরা। যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে যাওয়া আয়েশার ওপর লোকে সেনাপতির সাথে কেলেংকারী রটিয়েছে। মানুষ তাঁকে স্বতীত্বের অপবাদ দিয়েছে। আজ আয়েশার দু'চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে সারা জনমের জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ। মা বেরিয়েছেন, তার চেয়ে বয়সে বড় তার মেয়েকে বিধবার কাফন পরাতে। হায়, নবীজী মোহাম্মদ ! একবার এসে দেখে যান, আপনার বিষ-বৃক্ষে কি অপরূপ ফল ধরেছে। দেখে যান, আদরের দুলালী ফাতিমা জননীর স্বামীকে বধ করতে আপনার প্রীয়তমা বালিকা বধুর হাতে খঞ্জর। এ তো আপনারই শিক্ষা। এ তো আপনারই দেখানো সেই পথ। সর্বনাশা এই পথের সন্ধান উলমে সালমা জানতেন কিভাবে? উম্মুল-মোমেনিন (মুসলিম জাতীর মা) হজরত আয়েশা সৈন্যদল নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হবার আগে, তাঁর অন্যতম সতীন উম্মে সালমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে অনুরুধ করলেন। সালমা বল্লেন- 'অসম্ভব। আয়েশা তুমি ঐ সর্বনাশা পথে পা বাড়িও না। নবীজী আমাকে কানে কানে বলে গেছেন, একদিন একদল সসস্ত্র লোক ঐ পথে যাত্রা করবে যাদের নেতৃত্বে থাকবে একজন মুসলিম নারী। সে নারী, আমার উত্তরাধিকারী, খাতুনে জান্নাত, মা ফাতিমার স্বামী, আমার প্রীয় জামাতা হজরত আলীর নেতৃত্ব অস্বীকার করবে। নবীজী আরো বলেছেন, যারা আমার আলীর নেতৃত্ব অস্বীকার করবে, মনে করো তারা আমাকেই অস্বীকার করলো। আয়েশা তুমি সেই অভিশপ্ত নারী হতে যেওনা।'

আয়েশার শরীরের রক্তধারা আজ উজান বইছে। উম্মে সালমার নির্বোধ কথা শুনার সময় আয়েশার নেই। বসোরার পথে আয়েশার দলে আরো ২ হাজার লোক যোগদান করলো। বসোরার গভর্ণর আয়েশাকে বাধা দিলেন। ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা রাজধানীতে ঢুকে পড়লেন। তারা আলীর নতুন খলিফা, উসমান বিন হোনায়েফকে নামাজরত অবস্থায় বন্দী করে তাঁর দাঁড়ি গোফ মুন্ডায়ে শহর থেকে বের করে দিলেন। হজরত আলী যখন উম্মে সালমা মারফত আয়েশার মনোভাবের সংবাদ পেলেন, ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৪০

জন নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে আয়েশার সেনাবাহিনী বসোরা দখল করে নিয়েছেন। আলী তাথক্ষণিকভাবে মাত্র ৯ শত সৈন্য নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হয়ে যান। নবীজীর প্রাণ-প্রীয় দৌহিত্র হাসান ও হোসেন আর বসে থাকতে পারলেন না। পিতার নির্দেশে হজরত হাসান (রাঃ) অতি সত্ত্বর কুফায় চলে যান। সেখান থেকে ৯ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পিতার সাথে মিলিত হন। আলীর পরাজিত গভর্ণর, উসমান বিন হোনায়েফ এসে বসোরার অবস্থা বর্ণনা করলেন। আলী মুচকি হেসে বল্লেন- বৃদ্ধ গভর্ণর পাঠিয়ে ছিলাম, এ দেখছি যুবক হয়ে ফিরে আসলেন। ধীরে ধীরে হজরত আলীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২০ হাজারে আর আয়েশার ৩০ হাজার।

যুদ্ধের ময়দানে প্রথমাবস্থায় হজরত আলী ও হজরত তালহার মধ্যে সাময়ীক বাক-যুদ্ধ হলো। সন্ধ্যা ঘনায়ে আসলো, পরের দিন আরো আলাপ হবে বলে তারা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। ছোটবেলা থেকেই আয়েশা তার স্বামী মোহাম্মদের (দঃ) রণ-কৌশল দেখে আসছেন। পরের দিন আরো আলাপ করার জন্যে আয়েশা এতদূর আসেন নাই। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে আয়েশার সৈন্যদল হজরত আলীর সেনা-তাঁবুতে আক্রমন করে বসলো। অতি অল্পসময়েই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। রাত হতে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল, যুদ্ধ আর থামে না। হজরত আলীর দক্ষ সেনাবহিনীর সামনে আয়েশার সৈন্যগণ আর কতক্ষণ টিকে থাকবে? আয়েশার সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়লো। তারা পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিলো। এতক্ষণে দশ হাজার মুসলমানদের তাজা রক্তে শুষ্ক-মরুভূমি রক্ত-নদীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নবীজীর কাছ থেকে ‘সাইফুল্লাহ’ (আল্লাহর তরবারী) খেতাব প্রাপ্ত বীরের সামনে, উটের ওপর রমণীর উঁচু শীর ! হজরত আলীর আর সহ্য হয়না। নির্দেশ দিলেন, আয়েশার উটের পা কেটে ফেলা হউক। উট সহ আয়েশা মাটিতে পড়ে যান। হজরত আলী আয়েশার ভাই মোহাম্মদকে বল্লেন- ‘তোমার বোনকে উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে এসো’। হজরত আলী (রাঃ) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন বটে, কিন্তু ঘুনাক্ষরেও অনুমান করতে পারলেন না, সামনে তাঁর জন্যে ও তাঁর আদরের ধন হজরত হাসান ও হোসেনের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ ছিফ্‌ফিন ও কারবালা।

চলবে-